ইউনিট ১: জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা: পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূলে রয়েছে শিক্ষা। সভ্যতার আদিকাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়ে শিক্ষা বর্তমান আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদগণ পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে জাতীয় প্রয়োজন, সমাজ কাঠামো, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা রক্ষা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি বিবেচনা করে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন অর্থাৎ আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

সভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীতে অনেক দেশেই তাৎপর্যপূর্ণ সভ্যতা গড়ে উঠলেও শিক্ষাব্যবস্থা উৎকর্ষের দিক বিচার করলে প্রথমেই গ্রীকদের কথা বলতে হবে। মানব সভ্যতা ও শিক্ষার উন্নয়ন পাশাপাশি চললেও শিক্ষার মূল নীতিগুলো সর্বপ্রথম দৃষ্ট হয় প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্র স্পার্টা বা এথেন্সে। যে কারণে বেশির ভাগ শিক্ষাবিদগণই গ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার ঐতিহ্য নির্ণয়ের ভিত্তি হিসেবে গন্য করেন।

বাংলাদেশের বর্তমান যে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তা অন্যান্য দেশের মতই অতীতের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। অতীতের ক্রমধারা বাহিকতায় শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে শিক্ষার কাঠামো যেমনি পরিবর্তিত হয়েছে তেমনিভাবে শিক্ষার ধরনেও সে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য, অনেক নতুন ধারণা, নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ যেমনি নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে তেমনিভাবে সরকার নীতিগত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি অন্যতম। এ পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সাংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপট, শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ, শিক্ষার উৎস, উপাদান, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করব। এছাড়াও বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতিসমূহ, শিক্ষার দর্শন, শিক্ষার সাংবিধানিক ভিত্তি ও আইনী কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করব–

পাঠ ১.১: জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধারণা
পাঠ ১.২: শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ
পাঠ ১.৩: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানসমূহ এবং ধরণ
পাঠ ১.৪: শিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দর্শন ও নীতি
পাঠ ১.৫: শিক্ষার সাংবিধানিক ভিত্তি ও আইনী কাঠামো
পাঠ ১.৬: শিক্ষার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

পাঠ ১.১: জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেও সামগ্রিকভাবে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদান, শিক্ষাব্যবস্থার ধরণ এবং শিক্ষা কাঠামো। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হল:

ক. শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপাদান

যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপাদান চারটি। যথা–

১. শিক্ষার্থী
২. শিক্ষক
৩. শিক্ষাক্রম এবং
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১. **শিক্ষার্থী:** শিক্ষার্থী হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি কারণ তাকে ঘিরেই সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনেই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানগুলোর আবশ্যকতা রয়েছে।
২. **শিক্ষক:** শিক্ষক হচ্ছেন তিনি যিনি শিক্ষার্থীদের শেখাবেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে তিনিই শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।
৩. **শিক্ষাক্রম:** শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করেই মূলত সকল দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল কিছুর সমন্বিত রূপই হচ্ছে শিক্ষাক্রম।
৪. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত কোনভাবেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এখানেই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সমবেত হন এবং শিক্ষা কর্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পাঠ ১.৩ এ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপাদানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

খ. শিক্ষাব্যবস্থার ধরণ

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তিন ধরণের শিক্ষা প্রচলিত। যথা:

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং
৩. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা:** যে শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে সেটাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়।
২. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** শিক্ষার আরেকটি ধরন হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে, সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

৩. **অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য ধরন। জন্ম গ্রহণের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ নানাভাবে যা কিছু শিখছে সেটাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

পাঠ ১.৩ এ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ. শিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষা ধারা মূলত তিনটি। এগুলো হচ্ছে-

১. সাধারণ শিক্ষা
২. মাদ্রাসা শিক্ষা এবং
৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষার কাঠামো

সাধারণ শিক্ষা ধারার ক্ষেত্রে ৩টি স্তর রয়েছে, যথা প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। নিম্নে এ স্তরগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হল।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) বছর যা জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এর সুপারিশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন। তাছাড়া তিন বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরটি মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৭ বছর। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হলো− ৬ষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিকের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা ধারায় উচ্চ শিক্ষা সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদী [৩ বছর মেয়াদি স্নাতক পাশ + ২ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি] অথবা [৪ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান + ১ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি]।

মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঁচটি স্তর রয়েছে:

১. পাঁচ বছর মেয়াদি এবতেদায়ী;
২. পাঁচ বছর মেয়াদি দাখিল;
৩. দুই বছর মেয়াদি আলিম;
৪. তিন বা চার বছর মেয়াদি ফাজিল বা স্নাতক সম্মান;
৫. দুই বছর মেয়াদি কামিল।

ভোকেশনাল শিক্ষার কাঠামো

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে:

১. এক বা দুই বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স
২. তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স
৩. চার বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স

পাঠ ১.৪ এ বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষা ধারা মূলত কয়টি?
ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি

২. জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা কোন শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন?
ক. ষষ্ঠ
খ. সপ্তম
গ. অষ্টম
ঘ. নবম

৩. বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কয়টি স্তর রয়েছে?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাতে সামগ্রিকভাবে কোন বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে?
২. বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষাধারায় কয়টি স্তর রয়েছে ও কী কী?
৩. মাদ্রাসা শিক্ষার স্তর পাঁচটির নাম লিখুন।

গ. রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করুন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করলে সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পাঠ ১.২: শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষার বিকাশের পর্যায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষা বিকাশে ঐতিহাসিক পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বৈদিক শিক্ষা

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পার্থিব জীবনের তুলনায় আধ্যাত্মিকতার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হত। আর এ দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে তৎকালীন শিক্ষাদর্শনেও। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে আধ্যাত্মিক চেতনারই বহি: প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা জানা যায় তা হচ্ছে বৈদিক শিক্ষা। বৈদিক কথাটি এসেছে বেদ থেকে যা থেকে বোঝা যায় বেদই বৈদিক শিক্ষার মূল উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এ শিক্ষার ধারক ও বাহক ছিলেন প্রাচীন ভারতের আদি শিক্ষাগুরু জ্ঞানতাপস ঋষিগণ। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ-শিখনের সূচনা হত উপনয়ন অর্থাৎ ব্রাক্ষণ বালকের পৈতা ধারণের মধ্য দিয়ে। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযম সাধনার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলতে হত। বৈদিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল বিষয় ছিল শ্রুতি যা শোনার কাজকে বোঝানো হয়। শিক্ষাগুরুগণ বেদ পাঠ করতেন এবং শিষ্যগণ গভীর মনোনিবেশ সহকারে তা শুনে শিক্ষালাভ করতেন। এই শ্রুতি পদ্ধতির তিনটি সোপান ছিল শ্রবন, চিন্তন ও প্রণিধান। এ ছাড়াও বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টান্তচ্ছলে শিক্ষাদানের পদ্ধতিটিও প্রচলিত ছিল যেখানে গল্পের মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিষয়গুলো উপস্থাপিত হত। বিশেষত নৈতিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও গল্পের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বৈদিক শিক্ষায় আরো একটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হত যা হচ্ছে প্রশ্নোত্তর। শিক্ষণীয় বিষয় গুরু কর্তৃক উপস্থাপনের পর শিষ্যরা প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করত। বৈদিক শিক্ষায় সর্দার পড়ো ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল যে পদ্ধতিতে অগ্রবর্তী শিক্ষার্থী বা পড়ুয়া গুরুর অনুপস্থিতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করত। বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিপূর্ণভাবে বেদ শিখনের জন্য বারো বৎসর সময়কাল নির্ধারিত ছিল যে সময়কালে শিষ্য গুরুগৃহে অবস্থান করত। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা সমাপ্তি ঘোষণা করা হত। তখনকার দিনে শিক্ষা ছিল একান্তভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে গুরু ও শিষ্য উভয়ই অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করত ফলে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধের বিকাশে এ শিক্ষা ছিল অত্যন্ত উপযোগি ও কার্যকর।

বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। বৌদ্ধ মতবাদের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা। বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধবিহার। শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীগণকে বৌদ্ধবিহারে প্রবেশ করতে হত এবং শিক্ষা গ্রহণকালীন সময়টা ছিল সম্পূর্ণ আবাসিক যার ফলে পারস্পরিক সার্বক্ষণিক সাহচর্যে থাকার কারণে এখানে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক ছিল আত্মিক ও অত্যন্ত মধুর। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উৎস হিসেবে কাজ করলেও ক্রমান্বয়ে তা লোকায়ত জীবনভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যার একটি হচ্ছে হীনযান এবং অন্যটি মহাযান। মহাযান সম্প্রদায়ভুক্তরা অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী হওয়ায় লোকায়ত শিক্ষার প্রসারে এ সম্প্রদায় এগিয়ে আসে যার ফলশ্রুতিতে পাঠ্যসূচিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প, বানিজ্য ও চিকিৎসাবিদ্যা স্থান

পায়। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বৌদ্ধবিহারগুলোতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থলে ক্রমান্বয়ে দলগত শিক্ষার প্রচলন ঘটে যার ফলশ্রুতিতেই শ্রেণিশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রসার ঘটে। অন্যতম বৌদ্ধ আচার্য অতীশ দীপঙ্কও বঙ্গভূমি থেকে সুদূর চীন দেশে গমন করে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। উচ্চ শিক্ষার প্রসারে বৌদ্ধরাই এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং গৌরবের অধিকারী হচ্ছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে চতুর্বেদ, হীনযানশাস্ত্র, মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বসমূহ, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, রসায়নশাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যবহারিকশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্র ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয় যা প্রাচীন মগধের নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, যাদুবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা হত। আরেকটি খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বলভি। বৌদ্ধ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত অন্যান্য উচ্চ শিক্ষায়তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সারনাথ ও পাহাড়পুর। বর্তমান বাংলাদেশের নওঁগা জেলায় অবস্থিত পাহাড়পুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার প্রসারে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনন্য ভূমিকা পালন করেছে।

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ভাষা, শিল্প ও সাহিত্যের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও এক নতুন যুগের সূচনা করে। মুসলমানগণ মূলত ধর্মীয় প্রয়োজনে মসজিদ গড়ে তুললেও মসজিদভিত্তিক মক্তব ও মাদ্রাসা গড়ে ওঠায় সেগুলোকে কেন্দ্র করেই মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা হয়। অনেক মুসলিম শাসনগণ নিজেরা যেমনি জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী ছিলেন তেমনিভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষাদানেও তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। এ কারণে মুসলিম শাসনামলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে প্রচলিত বৈদিক শিক্ষা শুধুমাত্র ব্রাহ্মনরাই গ্রহণ করতে পারত কিন্তু মুসলিম সুলতানগণ মূলত তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই বৈষম্যের অবসান ঘটান। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় করে থাকেন। মসজিদ সংলগ্ন মক্তবগুলো ছিল প্রাথমিক শিক্ষালয় এবং মাদ্রাসাগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে কাজ করত। মাদ্রাসাসমূহে সাহিত্য ও দর্শণের পাশাপাশি কোরআন, হাদিস, ফিকাহ ও উসুল শেখানো হত। সুলতান ইলতুৎমিস বহুসংখ্যক মক্তব, মাদ্রাসা ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর রাজধানী ফিরোজাবাদে একটি বিরাট মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। সুলতানি আমলে দেশে বিরাজিত শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ এবং সর্বোপরি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি শিক্ষা প্রসারের জন্য অনুকূল ছিল। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যে অবদানের জন্য আলাউদ্দিন হুসেন শাহ অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা এবং বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন। মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষার প্রসারে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর পাশাপাশি তিনি প্রচুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলেও মসজিদ ও মাদ্রাসা ছিল অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে মুসলমান ও হিন্দু শিক্ষাধারার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটে যে সমন্বিত ধারা জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মুঘল আমলে সম্রাটদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। সে সময়ে তাঁরা শিক্ষার পরিমানগত ও গুনগত মান বৃদ্ধি উভয় দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের মিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান শিক্ষার প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল। মুঘল শাসনামলে উপমহাদেশের দিল্লী, আগ্রা,

ফিরোজপুর জৈনপুর, আহমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে যেখানে প্রখ্যাত আলেমগণ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। প্রথম দিকে এই শিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে সীমিত থাকলেও পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্তির সুযোগ লাভের জন্য হিন্দুরাও ফারসি শেখায় অগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে মাদ্রাসাসমূহ মুসরমান ও হিন্দু এই দুই সম্প্রদায়েরই শিক্ষা ও সাস্কৃতিক মিলনকেন্দ্রে পরিনত হয়।

মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা

ইউরোপীয় বনিকদের মধ্যে পর্তুগীজ বনিকরা সর্বপ্রথম ভারতে পদার্পন করে। তাঁদের সঙ্গে আগত মিশনারিরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় আদর্শে চার ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন−

- গীর্জা ও মিশনসংলগ্ন স্থানে পর্তুগীজ ও ল্যাটিন ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- অনাথ ভারতীয় শিশুদের জন্য আশ্রয়স্থল যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিবিদ্যা ও পেশামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ শিক্ষার জন্য জেসুইট কলেজ;
- ধর্মশিক্ষা ও পাদ্রী তৈরির সেমিনার।

পর্তুগীজরা ১৫৫৬ সালে গোয়াতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন যার ফলে মুদ্রিত পাঠসামগ্রী নির্ভর আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে। এজন্য ভারতের আধুনিক শিক্ষার সূচনাকারী হিসেবে পর্তুগীজ মিশনারীদের গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ মিশনারীগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় কয়েকটি অবৈতনিক বা দাতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মিশনারীগণ এদেশের শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত অবদান রেখেছেন এবং তাঁদের হাত ধরেই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মপ্রচার এবং সে কারণেই শিক্ষাকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তাঁরা বেছে নেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানী এবং মিশনারীগণের সমবেত প্রচেষ্টায় অবৈতনিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়, ধর্মীয় বিদ্যালয়, ভার্নাকুলার স্কুল, শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় ইত্যাদি নানা ধরনের শিক্ষা প্রতষ্ঠান গড়ে ওঠে যেখানে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। তৎকালীন অধিবাসীদেও ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনে অনেকগুলি ইংরেজি স্কুলও মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষার উন্নয়নেও মিশনারীদের বিশেষ করে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা অনন্য। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এবং সুবৃহৎ ইঙ্গবঙ্গ অভিধান প্রকাশ করেন।

বৃটিশ ভারতে শিক্ষা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতের শাসনভার লাভের পর শিক্ষার দায়িত্ব কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১১ সালে লর্ড মিন্টো ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে কোম্পানীর নিকট এক বিবরণী পেশ করেন। একই সাথে তিনি কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের সংস্কার এবং জৌনপুর ও ভাগলপুরে মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। মূলত ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে শিক্ষা সংস্কারের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়। এই সনদের অধীনে মিশনারীগণ এদেশে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পান। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ভাষা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলশ্রুতিতে দেশীয় ভাষায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা চিরতরে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছুসংখ্যক মানুষ ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে লাভবান হলেও সামগ্রিকভাবে জনগণের জন্য এটা কোন সুফল বয়ে আনেনি। বরং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা শ্রেণি বৈষম্য

সৃষ্টি করে জাতীয় সংহতির পথে এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের তত্ত্বাবধানে ১০০ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট একটি ঐতিহাসক শিক্ষা দলিল প্রণীত হয়। যা চার্লস উডের নামানুসারে উডের ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। এই ডেসপ্যাচটি উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। উডের ডেসপ্যাচে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত ধারা সুষ্টির প্রয়াস রয়েছে। যেটাকে এক ধরনের "ল্যাডার সিস্টেম" বলা চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা
↓
কলেজীয় শিক্ষা
↓
দেশীয় শিক্ষা

উডের ডেসপ্যাচ পরবর্তীকালীন শিক্ষার প্রকৃতি ও গতিধারা বিচার বিশ্লেষণের জন্য ১৮৮২ সালে ১ম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের সভাপতি স্যার উইলিয়াম হান্টারের নামে এই কমিশন হান্টার কমিশন নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৮৩ সালে ২২২ টি প্রস্তাবনা সম্বলিত ৬০০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন এই কমিশন সরকারের নিকট পেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে এই শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল করে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে বহুমুখী ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যসূচি প্রবর্তনের সুপারিশ করে থাকে। তারপর লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে শিক্ষাক্ষেত্র সংস্কারের জন্য সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন করেন যেখানে কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রন জানানো হয়নি। বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যম এই সম্মেলনে ১৬০ টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যেগুলির ভিত্তিতে লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন তাঁর শিক্ষানীতি যে সরকারি প্রস্তাবে পেশ করেন সেখানে স্বীকার করা হয় যে, বিগত ২০ বছরে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হলেও তার বিস্তার আশানুরূপ হয়নি। তবে ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক "ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট" জারি করা হয় যার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থা চালু এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ১৯০৪ সাল হতে সরকারি সাহায্য দেয়া শুরু হয়।

১৯১৯ সালে প্রকাশিত স্যাডলার রিপোর্টে প্রথমবারের মত মাধ্যমিক ও কলেজ পযায়ের শিক্ষা পরিচালনার জন্য "সেকেন্ডারি ও ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড" গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিকে ডিগ্রি কলেজ থেকে পৃথক করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে ম্যাট্রিকুলেশনের বদলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্যাডলার কমিশনের বাস্তবে রূপ নেয়া অন্যতম প্রধান একটি সুপারিশ হচ্ছে পূর্ববঙ্গের মানুষের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৩ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে গঠিত সার্জেন্ট কমিটি ১৯৪৪ সালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষার উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্বলিত একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্টে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সী নির্বাচিত কিছু ছেলে-মেয়ের জন্য ৬ বছর মেয়াদি উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা এবং এ শিক্ষায় উত্তীর্ণ কিছু শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ বছর মেয়াদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সুপারিশও এ রিপোর্টে ছিল। কারিগরি শিক্ষায় জোর দেবার পাশাপাশি দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী

শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার সুপারিশও এ কমিটি করেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শতকরা ১০/১৫ ভাগ শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ থাকা উচিত বলে এ কমিটি মত প্রকাশ করেছিল।

পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা

পাকিস্তান শাসনামলের শুরুতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের জন মানুষের আশা-আকাঙ্খার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানকে প্রধান করে "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি" গঠিত হয়। কমিটি প্রণীত সুপারিশে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বলা হয়। সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী ১৫ বছর বা সম্ভব হলে তার পূর্বেই প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট নির্ধারণের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনের মধ্যকার ভারসাম্যহীনতা দূর করার গুরুত্ব সুপারিশে তুলে ধরা হয়। মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার কথা বলা হয়। এছাড়াও কমিটি সুপারিশ করে যে, ইসলামিক শিক্ষার জন্য একটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। কমিটির সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিএ-ইন-এডুকেশন ডিগ্রি এবং পরবর্তী বছরে এমএ-ইন-এডুকেশন কোর্স প্রবর্তনের কথা বলা হয়। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের শিক্ষার উন্নয়নে কমিটি গঠন করলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কোন বাস্তব উন্নয়ন গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে গঠিত আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৫৯ সালে গঠিত শরীফ কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করলেও সেখানে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির সঠিক প্রতিফলন ছিলনা। একইসঙ্গে তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর উদাসীনতা ও অবহেলায় সুপারিশসমূহের বেশিরভাগই বাস্তবায়িত হয়নি।

বাংলাদেশ আমলে শিক্ষা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনের রিপোর্টেই প্রথমবারের মত আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। একই সাথে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ১৯৭৩ সালে। তৎকালীন সরকার ৩৭,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একসাথে জাতীয়করণ করেন। সদ্যস্বাধীন একটি দেশে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অনেক কঠিন হলেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালুর গুরুত্ব অনুধাবন করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা এ দেশের শিক্ষা বিস্তারে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলা হয়। কায়িক শ্রমের মর্যাদাদান ও গুরুত্ব অনুধাবনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করে তোলা এবং কর্মসংস্থান খুঁজে পাবার মত দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞান পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষা কার্যক্রম সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এই দুই ধারায় বিভক্ত হবে বলে কমিশন রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষা, টোল শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়েও এ রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশসমূহ বাস্তাবায়নের কৌশল নির্ধারণের জন্য ১৯৭৫ সালে "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি" গঠিত হয়। এই কমিটি প্রণীত রিপোর্টের আলোকে বিভিন্ন স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, ১৯৮৩ সালে মজিদ খান শিক্ষা কমিশন, ১৯৮৮ সালে মফিজউদ্দীন আহমদ শিক্ষা কমিশন, ১৯৯৭ সালে শামসুল হক শিক্ষা কমিটি, ২০০২ সালে এম.এ. বারী শিক্ষা কমিশন, ২০০৩

সালে মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন এবং সর্বশেষ ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশসমূহের আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অন্যতম যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ২০১৩ সালে। এক ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে যা পর্যায়ক্রমিক তিন ধাপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ধারার সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকেই জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কত সালে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. ১৭৬৪ সালে খ. ১৭৮০ সালে
গ. ১৭৮৫ সালে ঘ. ১৭৯১ সালে

২. ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের তত্ত্বাবধানে কত অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট শিক্ষা দলিল প্রণীত হয়?
ক. ৫০ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট খ. ৭৫ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট
গ. ১০০ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট ঘ. ১২৫ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট

৩. আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন কত সালে গঠিত হয়?
ক. ১৯৫৭ সালে খ. ১৯৫৯ সালে
গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

২. বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠিত নালন্দা ও বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে পাঠদান করা হত?।

৩. পর্তুগীজ বনিকদের সঙ্গে আগত মিশনারিরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে যে চার ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সেগুলোর নাম লিখুন।

৪. ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক জারিকৃত “ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সটি অ্যাক্ট” এর মূখ্য উদ্দেশ্য কী ছিল?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মুসলিম শাসনামলে উপমহাদেশে শিক্ষার প্রসারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।

২. পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বিবরণ দিন।

৩. বর্তমান শিক্ষায় মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

৪. বৃটিশ ভারতে শিক্ষার বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহের একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

৫. বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় ঐতিহাসিক ধারার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৩: জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপাদানসমূহ এবং ধরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপাদান চারটি। যথা–

১. শিক্ষার্থী;
২. শিক্ষক;
৩. শিক্ষাক্রম; এবং
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

১. **শিক্ষার্থী:** শিক্ষার্থী হচ্ছে যিনি শিক্ষাগ্রহণ করবেন বা যাকে শেখানো হবে। শিক্ষার্থী হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি কারণ তাকে ঘিরেই সমগ্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনেই শিক্ষাব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানগুলোর আবশ্যকতা রয়েছে। শিক্ষার্থী ব্যতিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণাটিই অচল। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আর যে সকল উপাদান রয়েছে তার সবকিছুই শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, শিক্ষার্থীই হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদান। শিক্ষাবিদগণও যৌক্তিক কারণে এই উপাদানটিকে শিক্ষা প্রক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে মূল্যায়ন করেন। কেননা শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাঝে শিক্ষার্থীর থাকা অপরিহার্য। শিক্ষার্থী ব্যতিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার কোন সুযোগ নেই।

২. **শিক্ষক:** শিক্ষক শিক্ষা প্রক্রিয়ার আবশ্যকীয় উপাদান। শিক্ষক হচ্ছেন তিনি যিনি শিক্ষার্থীদের শেখাবেন অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি এতটা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে এবং শিক্ষার্থীদের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন যে, অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর সংস্পর্শে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে তিনি যদি যথাযথ যোগ্য না হন তাহলে তা শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে একজন শিক্ষক জীবনব্যপীই একজন শিক্ষার্থী। নিজের উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং নতুন নতুন বিষয়ের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য তাঁকে সর্বদা জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট হতে হয়।

৩. **শিক্ষাক্রম:** শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম হচ্ছে যে কোন দেশের শিক্ষা কর্যক্রমের মেরুদন্ড। কারণ শিক্ষাক্রমের উপর ভিত্তি করেই মূলত সকল দেশের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সকল কিছুর সমন্বিত রূপই হচ্ছে শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমে শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সকল কিছুই অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীরা কী শিখবে, কোন প্রক্রিয়ায় শিখবে, কী কী শিক্ষা উপকরণ ব্যবহৃত হবে ইত্যাদি যেমন শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে তেমনিভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী হবে সেটাও শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্ট থাকে। কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জাতীয় আশা আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় শিক্ষাক্রমে তার প্রতিফলন ঘটে।

৪. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** শিক্ষা প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যকীয় হিসেবে বিবেচিত একটি উপাদান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত কোনভাবেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এখানেই শিক্ষার্থী

এবং শিক্ষক সমবেত হন এবং শিক্ষা কর্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা লাভের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা, টোল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবার কখনও কখনও মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি ধর্মীয় স্থাপনাও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই মূলত সকল দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মূলত এই চারটিই হচ্ছে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদান। এর বাইরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার জন্য পৃথক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাও কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান একটি উপাদান। এছাড়াও শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব, বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিরায়ত লোকাচার, শিক্ষার্থীর পরিবার, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি আরো বেশ কিছু উপাদান রয়েছে যা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকে।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধরণ

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরণের শিক্ষা প্রচলিত। যথা:

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা;
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা; এবং
৩. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা:** শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি তা মূলত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সুসংগঠিত এবং আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধারাবাহিক এবং ক্রম উচ্চস্তরে বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। শিক্ষার্থী রাষ্ট্র নির্ধারিত নির্দিষ্ট বয়সে আনুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা অর্জন শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত সনদকেন্দ্রিক (Certificate Oriented) শিক্ষা ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময় পরপর বা নির্দিষ্ট স্তর সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থী সনদ অর্জন করে থাকে এবং নির্দিষ্ট শ্রেণির বা স্তরের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পর সনদ প্রদানের জন্যই এ শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে।

২. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শিক্ষার একটি ধরন। মূলত উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে এই শিক্ষাধারার উদ্ভব। সাধারণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে, সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির জন্য, বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত এবং বিশেষ শিখন চাহিদা পূরণের জন্য, পৃথকভাবে বা সমন্বিত কার্যক্রমর অংশ হিসেবে পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non formal Education)। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা নতুন নয়। উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। ফলে এসব দেশে স্বাক্ষর জ্ঞানহীন জনগণের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এই সকল দেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা যায়। এ কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টিকারী শিক্ষাও বলা হয়। আবার অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের একার পক্ষে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেমনি সম্ভব নয় তেমনিভাবে অনেক সময় পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনা। এসকল ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সহায়ক, সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাজ করে থাকে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কখনই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারেনা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দিকগুলো হচ্ছে– (১) প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা, (২) উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা, (৩) কিশোর-কিশোরী শিক্ষা, (৪) বয়স্ক শিক্ষা, (৫) নব্যসাক্ষরদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা।

৩. **অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য ধরন হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education)। মানুষ তার জন্মের পর থেকেই নানাভাবে শিখছে এবং এই শিক্ষাগ্রহণ তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলছে। এ কারণেই বলা হয় যে, মানুষের শিক্ষা গ্রহণের সময়কাল হচ্ছে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। জন্মগ্রহণের পর মানুষ সবার আগে তার পরিবার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে কারণ পরিবারের মধ্যেই তার জন্মগ্রহণের পরবর্তী সময়কাল অতিবাহিত হয়। এরপর পরিবারের বা পরিবারের বাইরের গুরুজনদের কাছ থেকে এবং বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে তার শিক্ষাগ্রহণ হয়ে থাকে। প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ প্রতিনিয়তই যেমন শিখছে তেমনিভাবে সমাজ থেকেও সে শিক্ষা গ্রহণ করে। এ সকল শিক্ষা মানুষের ইচ্ছাকৃত নাও হতে পারে। এভাবে প্রতিনিয়ত মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে যেমন শিখছে তেমনি অনিচ্ছাকৃতভাবেও শিখছে। এই যে অনির্দিষ্ট নানা উপায়ে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা বহির্ভূত যে শিক্ষা মানুষ গ্রহণ করছে সেটাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই আমাদের শেখার বা আচার আচরণের অনেক বৈশিষ্ট্য ঠিক করে দেয়। মানুষের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধও মূলত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। জন্মের পর একটি শিশু কীভাবে কথা বলবে সেটা তাকে আলাদা করে শেখাতে হয়না। সে নিজে থেকেই শুনে শুনে কথা বলা শিখে ফেলে। প্রাচীন সমাজে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই ছিল শিক্ষা লাভের একমাত্র উপায় এবং সর্বজনীন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই তারা নতুন করে শিখত। আধুনিক সমজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা সর্বস্তরে প্রচলিত হলেও পারিবারিক শিক্ষাই এখনো শিশুর মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝাতেই সুনির্মল বসু লিখেছেন–

"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নাানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদান কয়টি?
ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

২. মানুষ প্রতিনিয়তই কোথা থেকে শিখছে?
ক. পরিবার থেকে
খ. বিদ্যালয় থেকে
গ. বন্ধুবান্ধব থেকে
ঘ. প্রকৃতি থেকে

৩. কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে?
ক. আনুষ্ঠানিক
খ. উপানুষ্ঠানিক
গ. অনানুষ্ঠানিক
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপাদানসমূহ কী কী?
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার উদ্ভব কী কারণে হয়েছে?
৩. পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাব্যবস্থার মূল উপাদানসমূহের মধ্যে যে কোন তিনটির বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করুণ।

পাঠ ১.৪: শিক্ষার কাঠামো, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, দর্শন ও নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষা ধারা মূলত তিনটি। এগুলো হচ্ছে-

১. সাধারণ শিক্ষা;
২. মাদ্রাসা শিক্ষা; এবং
৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষার কাঠামো

সাধারণ শিক্ষা ধারার ক্ষেত্রে ৩টি স্তর রয়েছে, যথা প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষা। নিম্নে এ স্তরগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হল।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর মেয়াদী (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) বছর যা জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এর সুপারিশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ছয় থেকে পূর্ণ দশ বছর পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ১৯৯০ সনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসেবে আইন পাশ হয়। এর পূর্বে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও অবৈতনিক ছিল, কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি নানা ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা প্রদান করে যা পর্যায়ক্রমিক তিন ধাপে বাস্তবায়ন করা হয় অর্থাৎ এর মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ধারার সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকেই জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মধ্যবর্তী শিক্ষাস্তরটি মাধ্যমিক শিক্ষা নামে পরিচিত। মাধ্যমিক শিক্ষার পরিধি ৬ষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৭ বছর। শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অনুযায়ী এই স্তরের শিক্ষাকে কিশোর ও কিশোরোত্তর কালের শিক্ষাও বলা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে তিনটি উপ-শিক্ষা স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা তিন বৎসর মেয়াদী নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি), দুই বৎসর মেয়াদী মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণি) এবং দুই বৎসর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)। সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের নিম্নমাধ্যমিকে প্রবেশের বয়স ১১, মাধ্যমিকে ১৪ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ১৬ বছর। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক উপস্তরের শিক্ষা অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাই স্কুলে দেওয়া হয়। খুব কম

ক্ষেত্রেই ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা পৃথকভাবে জুনিয়র হাই স্কুলে দেয়ার ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশের প্রায় ৯৭% হাইস্কুল এবং সকল জুনিয়র হাই স্কুল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে এখনো ঐতিহ্যগতভাবে কলেজ শিক্ষার অংশ হিসেবে দেখা হয়, মাধ্যমিক স্কুলের নয়। তাই এই স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ নামে পরিচিত। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠদান করা হয়। প্রায় ৯৭% উচ্চ মাধ্যমিক কলেজই বেসরকারি। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ছাড়া আরও দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়:

- স্কুল কাম কলেজ অর্থাৎ মাধ্যমিক বা হাইস্কুলের সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিযুক্ত প্রতিষ্ঠান।
- ডিগ্রি কলেজে, প্রায় সকল ডিগ্রি কলেজেরই উচ্চ মাধ্যমিক শাখা রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিকের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষা ধারায় উচ্চ শিক্ষা সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদী, অর্থাৎ [৩ বছর মেয়াদি স্নাতক পাশ + ২ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি] অথবা [৪ বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান + ১ বছর মাস্টার্স ডিগ্রি]। এ ছাড়া এম.ফিল বা পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য অতিরিক্ত ন্যূনতম যথাক্রমে ২ বছর এবং ৩ বছর সময় প্রয়োজন হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ডিগ্রি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। এ পর্যায়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মেডিক্যাল, প্রকৌশল, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

চিত্রঃ বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ধারার শিক্ষা কাঠামো

		শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস		
২৫	২০	ডক্টরেট		
২৪	১৯			
২৩	১৮	এম.ফিল		
২২+	১৭	মাস্টার্স	মাস্টার্স	উচ্চশিক্ষা
২১	১৬	স্নাতক		
২০	১৫	(সম্মান)		
১৯	১৪		স্নাতক (পাস)	
১৮	১৩			
১৭	১২	উচ্চ মাধ্যমিক		
১৬	১১			
১৫	১০	মাধ্যমিক		
১৪	৯			
১৩	৮	নিম্ন মাধ্যমিক		
১২	৭			
১১	৬			
১০	৫	প্রাথমিক		
৯	৪			
৮	৩			
৭	২			
৬	১			
৫		প্রাক-প্রাথমিক		
৪				
৩				
বয়স	শ্রেণি			

মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো

মাদ্রাসা শিক্ষার পাঁচটি স্তর রয়েছে:

১. পাঁচ বছর মেয়াদি এবতেদায়ী (সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরের সমমানের);
২. পাঁচ বছর মেয়াদি দাখিল (সাধারণ শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক স্তরের সমমানের);
৩. দুই বছর মেয়াদি আলিম (সাধারণ শিক্ষা ধারার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমমানের);
৪. তিন বা চার বছর মেয়াদি ফাজিল [সাধারণ শিক্ষা ধারার স্নাতক (পাশ) সমমানের ও স্নাতক সম্মান];
৫. দুই বছর মেয়াদি কামিল (সাধারণ শিক্ষা ধারার মাস্টার্স বা স্নাতকোত্তর সমমানের)।

ভোকেশনাল শিক্ষার কাঠামো

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে:

১. এক বা দুই বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স (৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য);
২. তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স (মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য);
৩. চার বছর মেয়াদী ডিগ্রি কোর্স (উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ভর্তির জন্য যোগ্য)।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সমূহ। এখান থেকে এসএসসি ভোকেশনাল, এইচএসসি ভোকেশনাল, কৃষি ডিপ্লোমা, প্রকৌশল ডিপ্লোমা ইত্যাদি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতি

শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিসমূহ মূলত দেশের শিক্ষানীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয় আবার শিক্ষানীতিতে সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত,বিজ্ঞান মনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও যে নীতিগত তাগিদ নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক- চেতনাবোধ,

কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিনড়ব শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা ।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশাদ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগুলোর মধ্যেই বাংলাদেশের শিক্ষাদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক ও মানবীয় গুনাবলীর উন্মেষ ঘটানোর কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনিভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে তাদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারটিও তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করাও অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হিসেবে এসেছে। পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, সকল ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকারের যে সর্বজনীনতা তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেও আগ্রহী করার কথা বলা হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক বিকাশের ব্যাপারটিও গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে। অর্থাৎ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যা বাংলাদেশের শিক্ষাদর্শনকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষা ধারা মূলত কয়টি?
ক. একটি
খ. দুইটি
গ. তিনটি
ঘ. চারটি

২. কত সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসেবে আইন পাশ হয়?
ক. ১৯৯০ সালে
খ. ১৯৯১ সালে
গ. ১৯৯২ সালে
ঘ. ১৯৯৩ সালে

৩. মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে কয়টি উপ-শিক্ষা স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে?
ক. দুইটি
খ. তিনটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোনগুলো?
২. মাদ্রাসা শিক্ষার কয়টি স্তর রয়েছে ও কী কী?
৩. সাধারণ শিক্ষা ধারার সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাকেই কোন প্রক্রিয়ায় জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়েছে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো সংক্ষেপে বর্ণনা করুণ।
২. জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এ শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও যে নীতিগত তাগিদ নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো লিখুন।

পাঠ ১.৫: শিক্ষার সাংবিধানিক ভিত্তি ও আইনী কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল হচ্ছে সংবিধান। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বিবৃত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে এবং শিক্ষাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে সেটা যেমন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে তেমনিভাবে একটি বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণেও যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং আইনী কাঠামোর মাধ্যমেই যে তা করতে হবে সে ব্যাপারটা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ণে এই অনুচ্ছেদসমূহই প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতার উল্লেখ যার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সকল ধর্মের অনুসারী শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ ১৭, ২৮ ও ৪১ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। নিম্নে অনুচ্ছেদসমূহ তুলে ধরা হল:

অনুচ্ছেদ ১৭. রাষ্ট্র

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য;

ঘ. কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই অনুচ্ছেদের আলোকে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং নির্ধারিত স্তর অর্থাৎ ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯০ সনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হিসেবে আইন পাশ হয়। এর পূর্বে অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও অবৈতনিক ছিল, কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল না। শিক্ষার্থীদের যে কোন ধরণের শিক্ষা প্রদান করলেই চলবে না বরং বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবার গুরুত্বের বিষয়টি অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাই পারে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক গড়ে তুলতে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে যথাযথ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২৮. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

১. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

২. রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

৩. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারীপুরুষ উভয়ের সমান অধিকারের ব্যাপারটি বিবৃত করার পাশাপাশি ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণভেদে কোন ধরণের বৈষম্যের সুযোগ যে নেই তা উল্লিখিত অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতার বিষয়টি এখানে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে শর্তহীনভাবে যে কেউ যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণের সমান সুযোগ লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

উল্লিখিত অনুচ্ছেদটিতে বিবৃত বিষয়টি বাংলাদেশ সংবিধানের একটি অন্যতম প্রধান দিক। কারণ রাষ্ট্রের সর্বস্তরের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা একটি আদর্শ ও জনকল্যানমুখী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেহেতু সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সুতরাং সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথা শিক্ষাক্ষেত্রে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

তাছাড়া সংবিধানে অনুচ্ছেদ- ১৫(ক), ১৬ ও ১৯(১) এ পরোক্ষভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত বিধান বিবৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ- ১৫ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে–
(ক) “অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা”।
অনুচ্ছেদ- ১৬
“নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্য কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
অনুচ্ছেদ- ১৯(১)
(১) সকল নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল কোনটি?
ক. আইন
খ. সংবিধান
গ. মূলনীতি
ঘ. অধ্যাদেশ

২. সকল নাগরিকদের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণের কথা সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?
ক. ১৬
খ. ১৫(ক)
গ. ১৯(১)
ঘ. ২৮

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সংবিধানে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কয়টি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং সেগুলো কত নম্বর অনুচ্ছেদ?
২. সংবিধানে শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে?
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সংবিধানে কী ধরনের নির্দেশনা রয়েছে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সংবিধান বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশনা প্রদান করেছে- ব্যাখ্যা করুন ।
২. সংবিধানে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোন দুটি অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ১.৬: শিক্ষার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষার রাজনৈতিক উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা কীভাবে রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা ও রাজনীতি (Education and Politics)

শিক্ষার ওপর রাষ্ট্রের সফলতা অনেকাংশেই নির্ভরশীল। কারণ শিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে শুধুমাত্র জাতীয় ঐক্যবোধই সৃষ্টি করেনা বরং নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে এবং দেশাত্ববোধ জাগ্রত করে। যার মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে এটা বলা যায় যে, শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন । একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তার রাজনৈতিক উপাদানের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার একটি আবশ্যকীয় শর্ত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ এবং ভাবধারা এসকল রাজনৈতিক উপাদানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থা সে অনুসারে পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক ইত্যাদি সকল ধরনের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারা অনুসারেই তাদের শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে শিক্ষাকে পরিচালিত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে উপযোগি মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় সংহতির মূল স্তম্ভ। এছাড়া শিক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দূরদর্শিতাসম্পন্ন যোগ্য নেতৃত্ব এবং আদর্শ নাগরিক তৈরি করা সম্ভব যা রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। এ ধরনের পরিবেশ দেশে স্থিতিশীলতা, শান্তি ও প্রগতি নিয়ে আসতে পারে এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারে। অতএব শিক্ষা তার কল্যাণকর আদর্শ দিয়ে রাজনৈতিক কার্যাবলিকে এমনভাবে পরিচালিত করবে যাতে সমাজে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হয়। এধরনের অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিক্ষা ও রাজনীতির সম্পর্ক নিবিড়। কোন দেশের শিক্ষা সেই দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় দর্শনে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় চেতনাবোধে আবদ্ধ করা সম্ভব হয়। এ ধরনের জাতীয় চেতনাবোধ রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এছাড়া রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থ সাহায্যে একটি দেশের শিক্ষা পরিচালিত হয় বলে রাষ্ট্র নানাভাবে সেই দেশের শিক্ষাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তবে যে কারণেই হোক, এ কথা সত্য যে শিক্ষার উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে আবার শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ হল নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। এ প্রসঙ্গে লর্ড ব্রাইসের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "শিক্ষার কাজ হল বিভিন্ন রাজনৈতিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ সাধন করা"। শিক্ষা ও রাজনীতি এভাবে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

শিক্ষায় রাজনৈতিক উপাদানের প্রভাব (Influence of Political Factors in Education)

পূর্বের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট যে শিক্ষায় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। মূলত যে রাজনৈতিক উপাদানসমূহ কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো হল রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সংবিধান। এসকল উপাদান প্রত্যক্ষভাবে একটা দেশের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব আদর্শ রয়েছে। কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের এই আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। একই সাথে শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসহ সামগ্রিক রূপরেখা ঐ আদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ সাহায্যে পরিচালিত হয় বলে শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়।

সরকার

প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক উপাদান হল সরকার। সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া দেশ পরিচালনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

রাজনৈতিক দল

যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপাদান রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসে সংবিধান মোতাবেক দেশ পরিচালিত করে। যেহেতু আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার প্রধান উপাদান রাজনৈতিক দল, সেহেতু রাষ্ট্রে কল্যাণমুখী এবং উন্নয়নে সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থেকে বা পরিচালনায় যুক্ত না থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংবিধান

সংবিধান রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত জীবন প্রণালী। সংবিধানে বিবৃত নীতিমালার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালাসহ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি কীরূপ হবে, কোন প্রক্রিয়ায় কাদেরকে সংযুক্ত রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে এবং কাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে ইত্যাদি সকল কিছু সংবিধানের মাধ্যমেই নির্ধারিত থাকে।

শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনীতির প্রভাব

বর্তমান সময়ে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সকল দেশের শিক্ষায় বিদ্যমান রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব রয়েছে। আধুনিককালে প্রায় সকল রাষ্ট্রে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব বহন করে এবং রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করা হয়। সুতরাং শিক্ষায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক।

দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ধারায় প্রবাহিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নতির

দিকে এগিয়ে নিতে হলে উপযুক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন কেবলমাত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সেই সাথে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপযুক্ত বাস্তবায়ন কৌশল ও কার্য-পদ্ধতির প্রয়োজন ।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ; সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন; প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত (১ম-১০ম শ্রেণি) সকল শিক্ষার্থীকে বছরের প্রথম দিনই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ; উপবৃত্তির ব্যবস্থাকরণ; জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ ইত্যাদি উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উদাহরণ। শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত এ সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তবে শুধুমাত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই হবেনা শিক্ষার যথাযথ উন্নয়নের স্বার্থে সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অঙ্গিকার থাকতে হবে। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কৌশল উদ্ভাবন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। কারণ এ সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে উপযোগি মাধ্যম কী?
ক. সঙ্গীত
খ. শিক্ষা
গ. খেলাধূলা
ঘ. অভিনয়

২. রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত জীবন প্রণালী কোনটি?
ক. আইন
খ. অধ্যাদেশ
গ. বিধিবিধান
ঘ. সংবিধান

৩. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষাকে কোন শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে?
ক. ৬ষ্ঠ
খ. ৭ম
গ. ৮ম
ঘ. ১০ম

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কী কী রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে?
২. স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লিখুন।
৩. শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কীভাবে ভূমিকা পালন করে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কিত- ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষাব্যবস্থাকে কি রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।